Funded by the European Union

SEHD
Society for Environment and Human Development

MISEREOR
IHR HILFSWERK

বনবিনাশ, বনায়ন অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমিগ্রাস থেকে বননির্ভর মানুষের সুরক্ষা

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
উন্নয়ন সহযোগী: ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মিজেরিওর

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলে বিশেষ করে দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী ও বনজীবী মানুষের মূল সমস্যা বন ও ভূমিকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে সনাতনী ভূমি অধিকার স্বীকৃত নয়। ফলে একসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শালবনে যেসব বনজীবী আদিবাসী মানুষ নির্বিঘ্নে বাস করতেন এবং বন থেকে অবাধে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারতেন তারা আজ তাদের সনাতনী ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন। তারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, বন বিভাগ এবং বহিরাগতদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন, আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, কখনো কখনো প্রাণ দিচ্ছেন, ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন এবং হাজার বছরের ঐতিহ্যগত চাষাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বনজীবী আদিবাসীদের সনাতনী ভূমি অধিকার প্রথম কেড়ে নেয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা, ১৮৬৫ সালে অ্যাক্ট সেভেন (১৮৬৫ সালের সপ্তম আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে। এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বনের উপর ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময় ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো বটে, কিন্তু ব্রিটিশদের প্রবর্তন করা আইন, নীতি, বনসম্পদ আহরণের নানা প্রক্রিয়া, বনায়ন ইত্যাদি অব্যাহত থাকল। এরপর বিভিন্ন সরকারের সময় উন্নয়ন প্রকল্প, রাবার চাষ, সেগুন চাষ, তামাক চাষ, হর্টিকালচার, সামরিকায়ন এবং বাঙালি পুনর্বাসন বিশেষ করে বনসম্পদ ব্যাপকভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে, তাদের কৃষি ব্যবস্থা বদলে গেছে নাটকীয়ভাবে এবং সেখানকার পরিবেশ পড়েছে হুমকির মুখে।

দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার যেসব গারো, কোচ এবং বর্মণ জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বন এলাকায় বাস করেন তাদের অবস্থাও আজ নাজুক। এ জেলাসমূহে শালবন এলাকায় বসবাসকারী এসব জাতিগোষ্ঠীর অধিকাংশের ভূমির মালিকানা দলিল নেই। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ লাখের মতো আদিবাসী এবং সমতলের আড়াই লাখের মতো আদিবাসী ও বাঙালি সবসময় ভূমির অধিকারের প্রশ্নে অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনার মধ্যে থাকছে এবং বনবিভাগ, নিরাপত্তা বাহিনী, পুনর্বাসিত বাঙালি এবং ভূমিগ্রাসীদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকছে।

বাংলাদেশে বনসম্পদ সবসময়ই সীমিত ছিল। বাংলাদেশের বন অধিদপ্তর ২০১৬ সালে দেশের ১৭.৬২ শতাংশকে বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত করে। তবে জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (ফাও)-এর ২০০৯ সালের হিসাবে বাংলাদেশে তখন বন ছিল ৬.৭ শতাংশ। ফাও-এর এ হিসাবই বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে বনের এ আচ্ছাদন কৃত্রিম বনায়নসহ। বন বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম বনায়নকে বন হিসাবে বিবেচনা করেন না।

বনভূমি সংরক্ষণ এবং বনজীবীদের সুরক্ষায় সরকারের কিছু উদ্যোগ আছে। নীতিগত উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইউএনডিপি'র সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ সালের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ফরেস্ট্রি মাস্টার প্লান তৈরি করে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের যেসব বিষয় সামনে আসছে এবং আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক নানা বন্দোবস্তের কারণে যেসব সুযোগ তৈরি হয়েছে সেসব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৭-২০৩৬ সালের জন্য হালনাগাদ করেছে। দেশি-বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মিলে এ পরিকল্পনা তৈরি করেছে। দীর্ঘমেয়াদি এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হলো বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তনের ২০ শতাংশ বনের আওতায় আনা, যার কেনোপি ডেনসিটি (বনের ছাউনি আচ্ছাদনের ঘনত্ব) থাকবে ৫০ শতাংশ; প্রাকৃতিক বন যাকিছু

অবশিষ্ট আছে তা এবং পাহাড়ি ও প্যারাবনের সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ বনবিনাশ রোধ; বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ; উপকূল অঞ্চলে সরকারি বনভূমি এবং নতুন চর যেখানে তৈরি হচ্ছে সেখানে জলবায়ুসহিষ্ণু বনায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী উপকূলীয় আশ্রয় বেষ্টনী তৈরি; এবং বনজীবী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি। কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বনপণ্য শিল্পের ও পেশার বিকাশ; বন নিয়ে গবেষণা এবং বন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা যাতে তারা বন নিয়ে যেসব লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে তা অর্জনে সহায়ক হয় (বাংলাদেশ ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৭-২০৩৬)।

ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বনায়ন প্রকল্পসমূহ বিশেষবিবেচনায় নিয়ে ঔপনিবেশিক বন আইনে বিভিন্ন ধরনের সংশোধন আনা হয়েছে। এর মধ্যে বন ব্যবস্থাপনার জন্য ফরেস্ট রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এফআরএমপি) নামক একটি প্ল্যানও সরকার তৈরি করে ১৯৯৭ সালে।

তবে সরকার এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেসব বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে তা নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সামাজিক বনায়ন, শিল্প বনায়ন এবং জ্বালানি কাঠের বন সৃষ্টি করতে গিয়ে যে বনবাগান তৈরি করা হয়েছে তা ব্যাপক প্রাকৃতিক বন বিনাশের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

আইএলও কনভেশন ১৬৯-এর ৪ ধারা:

১। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির উপর মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু, তাদের সম্পূর্ণভাবে দখলীকৃত নয়, কিন্তু তাদের জীবনধারণ ও ঐতিহ্যগত কার্যক্রমের জন্য প্রথাগতভাবে প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন ভূমি ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে যাযাবর জনগোষ্ঠী ও জুম চাষীদের অবস্থার প্রতি বিশেষ নজর প্রদান করতে হবে।

২। সরকার প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির পরিচিহ্নিত করা এবং তাদের মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকার কার্যকর সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক দাবীকৃত ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য জাতীয় আইনী ব্যবস্থার মধ্যে পর্যাপ্ত কার্যপ্রণালী গড়ে তুলতে হবে।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) গত তিন দশকের অধিককাল ধরে বন, বন বিনাশ এবং বনজীবী আদিবাসী ও অন্যান্য বননির্ভর মানুষের উপর বনখাতে নীতি, পরিকল্পনা ও প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছে, অনুসন্ধান চালাচ্ছে এবং প্রকাশ করেছে অর্ধশতাধিক বই, বিশেষ মনোগ্রাফ এবং তথ্যচিত্র। সেড প্রকাশিত জ্ঞান উপকরণ এবং অজানা অনেক তথ্যের উন্মোচন বন-সংশ্লিষ্ট নীতি ও প্রকল্পের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। সেড দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত ও প্রমান হাতে নিয়ে বলে এসেছে যে বিদেশী প্রজাতি দিয়ে কৃত্রিম বনায়ন বনজীবী মানুষ, পরিবেশ ও স্থানীয় জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কাজেই বনজীবীদের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক বন রক্ষা জরুরি। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণী মহল, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তর এ ব্যাপারে সেড-এর সাথে এখন একমত হলেও মাঠ পর্যায়ে তার বিশেষ প্রতিফলন নেই।

বন এলাকায় বনবিনাশের প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং বনজীবীদের মধ্যে যেসব ভালো অনুশীলন আছে সেসব সবার সামনে তুলে ধরতে সেড-এর এ প্রকল্প। প্রকল্পের নানা কার্যক্রম বনজীবী আদিবাসী এবং বননির্ভর অন্যান্য গোষ্ঠীর স্বপক্ষে নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এমটাই প্রত্যাশা। এ প্রকল্প নাগরিক সমাজ, কমিউনিটি প্রতিনিধি, কমিউনিটি সংগঠন, পরিবেশ ও মানবাধিকারকর্মী, শিক্ষক, নারী সংগঠন, আদিবাসী এবং বননির্ভর মানুষদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত, পরামর্শ, অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি, এসব পুঁজি করে তৈরি করা হয়েছে। সেড তিন দশকের অধিককাল ধরে আদিবাসী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহের পরিবেশগত ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছে। তাদের সাথে নিয়ে সেড গবেষণালব্ধ জ্ঞান উপকরণ তৈরি এবং তাদেরকে কর্মশালা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সমাবেশ ও সংলাপে একত্র করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জেলাসমূহে ভূমির অধিকার এবং বনের উপর বনজীবীদের সনাতনী অধিকার নিয়ে অর্থপূর্ণ কাজে তাদেরকে শক্তিশালী ও দক্ষ করতে এ প্রকল্প।

প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী

চূড়ান্ত উপকারভোগী—আদিবাসী, বনজীবী ও বননির্ভর মানুষ, যারা দুই ভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে অরণ্য আর বনভুমিতে বাস করছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও বনজীবী মানুষ: পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী এগারোটি—চাকমা, মারমা, চাক, বম, খিয়াং, লুসাই, খুমি, পাংখোয়া, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা এবং ত্রিপুরা। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনসংখ্যা ৯ লাখ ২০ হাজার ২৪৮ জন, যা এই এলাকার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। সারণি ১-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও বাঙালিদের জনসংখ্যা দেখানো হচ্ছে।

সারণি ১: পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী

জেলা	জনসংখ্যা[১]	
	আদিবাসী	বাঙ্গালি
রাঙ্গামাটি	৩৭২,৮৭৫	২৭৪,৭১১
বান্দরবান	১৯৭,৯৮৩	২৮৩,১২৩
খাগড়াছড়ি	৩৪৯,৩৯০	৩৬৪,৭২৯
মোট	**৯২০,২৪৮**	**৯২২,৫৬৩**

[১]জনসংখ্যা ও গৃহশুমারি ২০২২।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বড় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী চাকমা যাদের জনসংখ্যা ৪ লাখ ৮৩

হাজার ৩৬৫ জন; এরপর মারমা (২ লাখ ২৪ হাজার ২৯৯ জন) এবং ত্রিপুরা (১ লাখ ৫৬ হাজার ৬২০ জন)। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ৩৮০ (লুসাই) থেকে ৫২ হাজার ৪৬৩ (ম্রো)'র মধ্যে।

বাংলাদেশের ১০ শতাংশ এবং একমাত্র পাহাড়ি অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে আদিবাসী এবং বাঙালি জনসখ্যার বন্টন সেখানকার আদি বাসিন্দারে জন্য খুবই অস্বস্তিকর। এমনকি ১৯৪৭ সালে, যখন ভারত ভাগ হয়, তখন এই অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.৫ শতাংশ ছিল বাঙালি। ১৯৬০ সালের দিকেও, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লাখের কম। ১৯৬০-এর দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর থেকে আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং স্থানান্তর একটি বড় ধরণের উদ্বেগের বিষয়। এর পরের বড় ঘটনা যা আদিবাসীদের ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি এবং দেশান্তরের দিকে ঠেলে দেয় তা হল দুই দশক ধরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। ১৯৮০ সালের দিকে প্রায় পাঁচ লাখ বাঙালিকে পাহাড়ে আদিবাসীদের সনাতনী ভূমিতে বসানো হয়। এর ফলে বিরাট সংখ্যক আদিবাসীর বাস্তুচ্যুতি ঘটে। সরকারের পুনর্বাসন নীতির কারণে এক লাখের মতো পাহাড়ি আদিবাসী তাদের সনাতনী ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়। এদের অর্ধেকের মতো ভারতে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নেয় এবং বাকীরা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকীকরণ এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় সহিংসতা, নজিরবিহীন বনবিনাশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নজিরবিহীন আহরণ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল সংখ্যক আদিবাসীকে তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে এবং প্রথাগত ভূমির ব্যবহারের অধিকার খর্ব করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি কোনায় ব্যাপক সামরিকীকরণ ও বাঙালি সেটেলারদের উপস্থিতি আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক যেন চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ছাড়াও কিছু বাঙালি আছে যারা কয়েক প্রজন্ম ধরেই পাহাড়ে বসবাস করছে। এদেরকেও বনজীবী ও স্থানীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এদের সংখ্যা আড়াই লাখের মতো। এই প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী প্রায় ১২ লাখের কাছাকাছি মানুষ। এরা হয় ভূমি ও বনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, নয়তো নজিরবিহীন বনবিনাশ, বনায়ন অর্থনীতি,

উন্নয়ন প্রকল্প, জলবায়ু পরিবর্তন, সামরিকীকরণ এবং বাঙালি সেটেলারদের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ।

টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার আদিবাসী ও বনজীবী মানুষ: উত্তর-মধ্যাঞ্চলের তিন জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী গারো, কোচ ও বর্মণ। এই তিন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এই তিন জেলার বনভূমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। এছাড়াও জমিদার আমল থেকে টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বিশেষত শালবনের ভিতর অনেক বাঙালি বসবাস করছে। সমতলভূমির শালবনের ভিতরে গ্রামগুলোতে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষেরই জমির মালিকানা দলিল নেই। নিচের ছকের মাধ্যমে উত্তর-মধ্যাঞ্চলের এই তিন জেলায় বসবাসকারী আদিবাসীদের জনমিতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সারণি ২: টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার আদিবাসী জনসংখ্যা

জাতিগোষ্ঠী	টাঙ্গাইল	গাজীপুর	ময়মনসিংহ	মোট
গারো	২০,০০০	২০০	৪০,৬৯৩	৬২,৫৯৩
কোচ	১৮,৩০৫	১২,৮২৬	৭,৮০৯	৩৮,৯৪০
বর্মণ	২,৫০০	৬,৩৯৩	৫০০	৯,৩৯৩
	৪০,৮০৫	২০,১১৯	৪৯,০০২	১০৯,৯২৬

উৎস: সেড জরিপ, ২০১৪; কারিতাস বাংলাদেশ জরিপ, ২০২১; কোচ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ইনভেন্টরি ২০২৩-২০২৪।

*২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, এই তিন জেলায় আদিবাসী জনসংখ্যা ৬১ হাজার ১৩৩, যা মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৫২ লাখ ৬৩ জনের ০.৪ শতাংশ। কোচ এবং বর্মণ উভয় জাতিগোষ্ঠীই হিন্দু ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে অনেক সময় তাদেরকে বাঙালি হিসেবে গণনা করে হয়।

উপরের ছকে প্রদর্শিত এই তিনটি জাতিগোষ্ঠী গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার শালবন এলাকায় ৩১০টি গ্রামে বসবাস করে। এই গ্রামগুলোর অধিকাংশই টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত। বাঙালিরা বসবাস করছে বনভূমিজুড়ে শত শত গ্রামে। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫০.১১ একর জুড়ে শালবন যার প্রায় ৪০ শতাংশ সংরক্ষিত বন। ময়মনসিংহ জেলায় বনের আয়তন ৩৮ হাজার ৮৬০.১৪

একর। এর মধ্যে সরকারি হিসাবে সর্বসাকুল্যে ১৫ শতাংশ ভূমিতে শালবন অবশিষ্ট আছে এবং শালবনের একটা বড় অংশ শিল্পায়ন, নগরায়ন ও কৃষির জন্য দখল হয়ে গেছে। আদিবাসীদের যেসব গ্রাম আগে অরণ্যবেষ্টিত ছিল, সেগুলো বহিরাগতদের জবরদখলের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এক সময়কার অরণ্যবেষ্টিত অধিকাংশ গ্রামের চারপাশ আজ বিরানভূমি।

জমিদারি আমল থেকে বনভূমিতে বসবাস করলেও অধিকাংশ মানুষেরই তাদের ব্যবহৃত জমির কোনো মালিকানা দলিল নেই। ২০১৭ সালে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর শালবনের ৪৪টি গ্রামে পরিচালিত সেড-এর এক জরিপে মাত্র ১৩ শতাংশ বাঙালি এবং ৪.১৯ শতাংশ আদিবাসী গারোদের বসতঘরের জমির মালিকানা দলিল পাওয়া গেছে। উঁচু ভূমিতে যেখানে কলা, আনারস, মশলা ও অন্যান্য ফসল আবাদ হয়, সেখানে মাত্র ৪.৮৩ শতাংশ বাঙালি ও ২.৬১ শতাংশ গারোর জমির দলিল রয়েছে। নিচু ভূমিতে মাত্র ৯.৬৭ শতাংশ বাঙালি এবং ১১.১৭ শতাংশ গারো পরিবারের জমির মালিকানা দলিল রয়েছে। শালবনের অন্যান্য অংশে জরিপেও একই ফলাফল পাওয়া গেছে। নজিরবিহীন বনবিনাশ ও ভূমি দখল বনজীবী ও পরিবেশের উপর মারাত্মক বহির্মুখী প্রভাব ফেলেছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনকেও প্রভাবিত করছে।

প্রকল্পের অন্যান্য অংশীজন

ক। নাগরিক সমাজ, কমিউনিটি, পরিবেশ সংগঠন এবং মানবাধিকার কর্মী: আদিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিক সমাজ, কমিউনিটি, মানবাধিকার এবং পরিবেশ সংগঠন রয়েছে যারা আদিবাসী, বনজীবী এবং বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমির অধিকার রক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করে। আদিবাসীদের এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: জয়েনশাহি আদিবাসী সমাজ কল্যাণ সংস্থা (মধুপুরের গারো ও কোচদের মধ্যে কর্মরত), বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী সংগঠন (গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ-এর কোচদের মধ্যে কর্মরত), তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা (খাগড়াছড়িভিত্তিক), মোনঘর (রাঙ্গামাটিভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), জাবারাং কল্যাণ সমিতি এবং বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ (খাগড়াছড়িভিত্তি), ম্রোচেত (বান্দারবানভিত্তিক ম্রো জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন), তাজিংডং (আদিবাসীদের উন্নয়ন এবং অধিকার নিয়ে কর্মরত),

হিউম্যানিটারিয়ন ফাউন্ডেশন (বান্দরবানভিত্তিক) এবং গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (বান্দারবানভিত্তক)।

খ। নারী সংগঠন: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীদের নিয়ে কাজ করে এমন উল্লেখযোগ্য সংগঠন: আচিক মিচিক সোসাইটি (মধুপুরভিত্তিক গারো ও কোচ নারীদের সংগঠন), বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি (বান্দরবানভিত্তিক আদিবাসী নারী সংগঠন), অনন্যা কল্যাণ সংগঠন (বান্দরবানভিত্তিক বেসরকারি আদিবাসী নারী সংস্থা), উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক (পার্বত্য চট্টগ্রামভিত্তিক আদিবাসী নারী অধিকার সংস্থা), খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি (খাগড়াছড়িভিত্তিক) এবং হিল উইমেন ফেডারেশন (পার্বত্য চট্টগ্রামভিত্তিক আদিবাসী নারী সংগঠন)।

এসব সংগঠন আদিবাসী এবং নারীদের উন্নয়নে কাজ করে এবং আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য তুলে ধরে। এদের অনেকগুলি প্রাকৃতিক বন, পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে ভালো চর্চা এবং উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করে এবং সেসবের প্রচার করে। তবে, অধিকার আদায়ের জন্য নিজেদের কণ্ঠ শক্তিশালী করতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। এর জন্য গবেষণা, জরিপ, অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণে দক্ষতা বাড়ানো দরকার। গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমে এসব সংগঠনকে যুক্ত করে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। ফলে, প্রকল্পের গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যক্রম থেকে তৈরি জ্ঞান উপকরণ তারা সহজে আত্নস্ত করতে পারবে এবং কাজে লাগাতে পারবে। সেড আদিবাসীদের সাথে তিন দশকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রকল্প ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

গ। আন্দোলন, প্রথাগত সংগঠন ও সংহতি নেটওয়ার্ক: পার্বত্য চট্টগ্রামে ও উত্তর- মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতে স্থানীয় ও প্রথাগত সংগঠন রয়েছে যারা বন ও ভূমির উপর প্রথাগত অধিকার এবং প্রাকৃতিক বন রক্ষায় সচেষ্ট। এই সকল সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান নেটওয়ার্ক যেটি তিন পার্বত্য জেলার ৩৭৬ জন প্রথাগত হেডম্যান-এর একটি সংগঠন (হেডম্যান হলেন একটি মৌজার প্রধান উপ-প্রধান), পার্বত্য চট্টগ্রাম উইমেন হেডম্যান- কার্বারী নেটওয়ার্ক যেটি ২০ জন মহিলা হেডম্যান এবং ৫৫০ জন মহিলা কার্বারীদের একটি সংগঠন (কার্বারি হলেন গ্রাম বা পাড়া প্রধান), মুভমেন্ট ফর দি প্রটেকশন অফ ফরেস্ট অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস ইন দি সিএইচটি (আদিবাসীদের সনাতনী ভূমির অধিকার নিয়ে কাজ করে), পার্বত্য

চট্টগ্রাম সিটিজেন কমিটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক) এবং ইউনাইটেড কাউন্সিল অফ ইনডিজেনাস অরগানাইজেশন অফ গ্রেটার ময়মনসিংহ যারা বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি ও বনের অধিকার নিয়ে কাজ করে (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও গাজীপুর ভিত্তিক)।

বনভূমিতে সনাতনী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। তবে এদের অধিকাংশ নিবন্ধিত নয়। কোনো কোনো সংগঠন কৌশলগত কারণে নিবন্ধন নেয় না। এদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সেড ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। একদিকে প্রকল্প থেকে তৈরি জ্ঞান উপকরণ তারা সহজে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে, অন্যদিকে যারা এসব সংগঠনের সাথে যুক্ত, তারা বন ও বনভূমিতে সনাতনী অধিকার নিয়ে জটিল বিষয়সমূহে কাজ করে দক্ষতা বাড়াবার সুযোগ পাবেন।

ঘ। জাতীয় পর্যায়ের নাগরিক সংগঠন: জাতীয় পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো বনভূমি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সেড ও আদিবাসীদের সাথে কাজ করে। এরা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

ঙ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং যোগাযোগ মাধ্যম: প্রকল্পের গবেষণা এবং অনুসন্ধান কাজে বিশ্ববিদ্যালয় এবং যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষভাবে জড়িত থাকবে। গবেষণা পদ্ধতি তৈরি এবং গবেষণা ও অনুসন্ধান চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, যোগাযোগ, সাংবাদিকতা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এবং সাংবাদিকরা যুক্ত হবে। অনুসন্ধান থেকে যেসব রিপোর্ট তৈরি হবে তা সংবাদপত্রে ছাপার জন্য পাঠানো হবে। গবেষণালব্ধ বই ও অন্যান্য উপকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কোর্সে ব্যবহৃত হবে এবং বন ও বনজীবীদের বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আদিবাসীদের সমৃদ্ধ করবে।

চ। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রশাসন:
যেসব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতে বন ও ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোর মধ্যে অন্যতম পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন। গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমে এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা হবে এবং তাদেরকে সাথে রাখা হবে।

সার্বিক উদ্দেশ্য

উত্তর-মধ্যাঞ্চলের টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী ও বনজীবী মানুষের প্রথাগত অধিকারের সুরক্ষা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জেলাসমূহে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ও বনজীবী মানুষের বনভূমিতে প্রথাগত অধিকার এবং প্রাকৃতিক বন সুরক্ষায় সমর্থন বৃদ্ধি ও পথ-নকশাঁ প্রণয়ন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

১। উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমির উপর প্রথাগত অধিকারের বর্তমান অবস্থা এবং বনবিনাশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতি সম্পর্কে নাগরিক সমাজ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, আদিবাসী, বনজীবী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মধ্যে, সচেতনতা বৃদ্ধি।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামে ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতে বনভূমির উপর প্রথাগত অধিকার রক্ষার আইনি কাঠামো সম্পর্কে নাগরিক সমাজ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, আদিবাসী, বনজীবী,

বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৩। উত্তর-মধ্যাঞ্চলের শালবন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনা এবং বনবিনাশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি।

৪। বন ও ভূমির উপর প্রথাগত অধিকার এবং প্রাকৃতিক বন রক্ষায় নাগরিক সমাজ সংগঠন, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, আদিবাসী এবং বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৫। বনবিনাশ ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধ এবং সনাতনী ভূমির অধিকার রক্ষায় বেসরকারি ও সরকারি-আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

ক) গবেষণা, জরিপ ও বিশ্লেষণ

১। জরিপ: বনবিনাশ ও বনবিনাশের ফলাফল নিয়ে চারটি জরিপ হবে উত্তর-মধ্যাঞ্চলের শালবন এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায়। এরমধ্যে দু'টি জরিপ হবে এ দুই অঞ্চলে সনাতনী বনভূমি ও ভূমিগ্রাস নিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীত কাল থেকে সেখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠী সনাতনী ভূমি অধিকার ভোগ করে আসছে। কিন্তু এখন তাদের সনাতনী ভূমি অধিকার মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে এসেছে। জরিপ থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ তৈরি হবে তা সবাই ব্যবহার করতে পারবে। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলার মূলত শালবনে বসবাসকারী গারো, কোচ ও বর্মণ জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের প্রথাগত অধিকারের প্রশ্নে চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। জরিপের মাধ্যমে বনভূমিতে তাদের অধিকার এবং ভূমি গ্রাসের চিত্র উঠে আসবে। প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত যেমন বিশ্লেষণ করা হবে তেমনি প্রাথমিক তথ্যের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এক হাজার পাঁচশো এবং সমতলে এক হাজার পরিবারের উপর জরিপ চালানো হবে।

দুই অঞ্চলে দুটি জরিপ হবে নজিরবিহীন বনবিনাশ, বনায়ন অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূমি গ্রাসের ফলাফল নিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জেলাসমূহের আদিবাসী ও বনজীবী মানুষরা এসবের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তারা তাদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবসময় লড়াই করছে এবং বন বিভাগ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং বহিরাগতদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছে। প্রাথমিক তথ্যের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এক হাজার পাঁচশো এবং সমতলে এক হাজার পরিবারের উপর জরিপ চালানো হবে। পাশাপাশি এফজিডি, কেআইআই এবং জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করা হবে। জরিপ রিপোর্ট সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

২। সনাতনী ভূমি অধিকার ও বনজীবী মানুষের অধিকার বিষয়ক আইন ও সনদ নিয়ে গবেষণা: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেশ কিছু আইন ও সনদ বনাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ভূমি ও বনজসম্পদের উপর সনাতনী অধিকার প্রদান করার জন্য প্রণীত হয়েছে। জাতীয় আইনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার যেসব আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করেছে সেসবের বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেড ইতিমধ্যে এসব আইন ও সনদ চিহ্নিত করেছে। আইন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় প্রকল্পের গবেষণা দল এসব আইন ও সনদের মূল বিষয় বিশ্লেষণ করবে এবং সবার ব্যবহারের উপযোগী করে প্রকাশ করবে যা মানবাধিকার ও উন্নয়নকর্মী ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজ করবে।

৩। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ভালো অনুশীলন নিয়ে গবেষণা: বনাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্যদের মধ্যে অনেক ভালো অনুশীলন, চর্চা এবং স্থানীয় প্রযুক্তি আছে যা পরিবেশের সুরক্ষায় সহায়ক এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসবের মধ্যে গ্রাম্য বন, খাদ্য ভাণ্ডার, বিশ্বাস,

মূল্যবোধ, ঐতিহ্যবাহী কৃষি, রাসায়নিক সার ছাড়া চাষাবাদ, তাঁত ইত্যাদি অন্যতম। সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার গবেষক দল এসব ভালো অনুশীলন চিহ্নিত করবে, সেসব লিখবে এবং একটি গ্রন্থে প্রকাশ করবে যা বিশেষ করে কমিউনিটি, পরিবেশ কর্মী, বন বিভাগ এবং সরকারি অন্যান্য সংস্থার কাজে লাগবে।

৪। বন এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার অনুসন্ধান: ভূমিগ্রাস, মামলা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, আক্রমণ ও নানা ধরনের হয়রানির খবর আসে বনাঞ্চল থেকে। প্রকল্প চলাকালীন ৪২ মাসে ১২টি কাঠামোগত মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার অনুসন্ধান করা হবে এবং অনুসন্ধানী রিপোর্ট জাতীয় সংবাদপত্র ও প্রকল্পের নানা প্রকাশনায় ছাপা হবে। বনবিনাশ, বনবিনাশের ফলাফল, বনাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনা অনুসন্ধানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেড-এর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি নানা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংবাদ মাধ্যমও যোগ দিবে।

৫। অনুসন্ধানী তথ্যচিত্র: তথ্যচিত্র নির্মাণ: রাবার, সেগুন, পাল্প ও তামাকের বানিজ্যিক চাষ ও এসবের বিরূপ প্রভাব নিয়ে একটি অনুসন্ধানমূলক তথ্যচিত্র নির্মিত হবে। বনায়ন অর্থনীতির ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনে বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বনজীবী মানুষের ভালো অনুশীলন তথ্যচিত্রে গুরুত্ব পাবে। সেড ইতিমধ্যে ১২টির মতো তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে সাতটি ভূমি, বন ও বনজীবী সম্প্রদায় নিয়ে তৈরি। গবেষণা ও অনুসন্ধানের সাথে সাথে তথ্যচিত্র নির্মানের কাজ চলবে।

খ) দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভালো অনুশীলন (বেস্ট প্রাকটিসেস) নিয়ে গবেষণা, ডকুমেন্টেশন, সংলাপ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে পরিবেশকর্মী, বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নানা সংগঠন ও উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেড পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম বছর থেকেই আরো নানা প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি হবে। এসব হাতে নিয়ে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ভূমিগ্রাস, বনায়ন অর্থনীতি, সরকারি বনভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদি বিষয়ে চারটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। তাছাড়া বাংলাদেশে বৈচিত্র্য, সহিষ্ণুতা এবং শান্তি নিয়ে দুটো এবং জ্ঞান উপকরণ দক্ষতার সাথে কাজে লাগানো ও বিতরণ নিয়ে আরো একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। এসব প্রশিক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে নির্বাচিত কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উন্নয়ন পরামর্শক, অর্থনীতিবিদ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তারা প্রশিক্ষক হিসাবে থাকবেন। এ প্রশিক্ষণ যারা পাবেন তারা মাঠ গবেষণা, ডকুমেন্টেশন, অনুসন্ধান ও জরিপে অংশগ্রহণ এবং নিজেদের অধিকার নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

গ) কনভেনশন ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বন, বনবিনাশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও সেসবের প্রভাব নিয়ে যেসব গবেষণালব্ধ জ্ঞান উপকরণ তৈরি হবে সেসব সবার হাতে তুলে দিতে এবং এসব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের শেষ বর্ষে একটি কনভেনশন ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে। দুইদিনব্যাপী কনভেনশনে আলাপ-আলোচনা এবং সংলাপের মাধ্যমে বনজীবী মানুষের অধিকার তুলে ধরা হবে। এখানে সরকারি-বেসরকারি বিশিষ্টজন এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী, পরিবেশকর্মী ও সংবাদ মাধ্যমের ব্যক্তিবর্গ যোগ দেবেন। কনভেনশনের পাশাপাশি সাত দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীরা বন, বনবিনাশ, বনায়ন

অর্থনীতির প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বনজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা, ভালো অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকচিত্র দেখতে পাবেন।

ঘ) প্রকাশনা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিপোর্ট

গবেষণা, জরিপ, অনুসন্ধান, ইনভেনটরি ও ডকুমেন্টেশন থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত এবং বিশেষণ তৈরি হবে, সেসব থেকে বনবিনাশ, সনাতনী ভূমি অধিকার ও বনবিনাশের ফলাফল নিয়ে চারটি রিপোর্ট; যেসব জাতীয় আইন ও সনদ বনজীবী মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে সেসব নিয়ে একটি রিপোর্ট; অনুসন্ধানী রিপোর্টের একটি সংকলন; ১০টি ভালো অনুশীলন (বেস্ট প্রাকটিসেস) নিয়ে একটি রিপোর্ট; বন, সনাতনী ভূমি অধিকার নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল; একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী ক্যাটালগ; বনায়ন অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র; নিউজলেটারের তিনটি সংখ্যা; আইনি এবং নীতি সংস্কার নিয়ে একটি পেপার এবং একটি ব্রোসিউর প্রকাশিত হবে।

ঙ) প্রকল্পের যাত্রাশুরু ও সমাপনী কর্মশালা

প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর শুরুতে একদিনের একটি এবং শেষে তিনদিনের একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। প্রকল্পের শুরুতে সব স্টেকহোল্ডারদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাদের মতামত এবং পরামর্শ নেয়া হবে। প্রকল্পের শেষে তিনদিনের কর্মশালায় প্রকল্পে তৈরি করা জ্ঞান উপকরণ সবাইকে দেয়া হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে প্রকল্পের ফলাফল টিকে থাকে তার জন্য কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হবে।

চ) সমন্বয় এবং সংহতি নেটওয়ার্ক সভা

প্রকল্পের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের চার বছরে চারটি সমন্বয় সভা আয়োজন করা হবে। এতে অংশ নিবেন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, কমিউনিটি প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। সমন্বয় সভায় প্রকল্পের কার্যক্রম, কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা এবং সংহতি নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার জন্য আলাপ-আলোচনা হবে। যারা এসব মিটিং-এ অংশ নিবেন তাদের নিয়ে তৈরি হবে একটি স্টিয়ারিং কমিটি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে কীভাবে

এটি একটি অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সেড, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মী, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, প্রকল্পের অন্যান্য অংশীজন, সংহতি নেটওয়ার্ক ও চূড়ান্ত উপকারভোগীদের থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাদের গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনায় সেড বিশেষ দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। গবেষণা কাজে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মীদেরও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একই সাথে পেশাদার অন্যান্য গবেষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পেশাদারি সহযোগিতাও নেওয়া হবে।

প্রকল্পটি প্রণয়নকালে সেড-এর সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও চূড়ান্ত উপকারভোগীদের নানা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে অনেকবার আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ সভা, কর্মশালা ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পরামর্শ নেয়া হয়েছে। এছাড়া গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন অধ্যয়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষকদের সাথেও পরামর্শ করা হয়েছে। প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগীদের মধ্যে যেসব জনগোষ্ঠী আছে তাদের সাথে এবং সংশ্লিষ্ট নানান প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের সাথে পরামর্শ ও

তথ্য আদান-প্রদান অব্যাহত থাকবে।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য পেশাদার পরিসংখ্যানবিদদের সহায়তা নেওয়া হবে। গবেষণা থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত তৈরি হবে তা সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্য প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও কর্মীগণ তাদের পেশাদার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন।

প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মী, প্রকল্পের অন্যান্য অংশীজন, চূড়ান্ত উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, পরামর্শ সভা, সংলাপ এবং কনভেনশন আয়োজন ও পরিচালনা করবেন। এসবের সাথে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, নির্বাচিত প্রতিনিধি, পেশাদার গবেষক, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত হবেন।

প্রকাশনা, অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি, তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যাপারেও সেড-এর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রোডাকশনের কাজ সম্পন্ন করবে। প্রকাশনার কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদার লেখক, অনুবাদক এবং ডিজাইনারের সাহায্য নেওয়া হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড): ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেড-এর কাজের দুটি প্রধান ক্ষেত্র পরিবেশ ও মানবাধিকার। দুইটি ক্ষেত্রই অনেক বড়। পরিবেশ ও মানবাধিকারের সার্বিক অবস্থা নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুণগত গবেষণা, অনুসন্ধান, রিপোর্টিং, ডকুমেন্টেশন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সেড-এর অন্যতম কাজ। গবেষণা, অনুসন্ধান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, কমিউনিটির কণ্ঠ শক্তিশালী করা, তথ্যের আদান-প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমে সেড গত তিন দশকের অধিক সময়

ধরে বন, বনবিনাশ ও আদিবাসীদের বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়েছে। সেড-এর ১০০'র অধিক প্রকাশনা এবং জ্ঞান উপকরণের মধ্যে-৫০ এর মতো বন ও আদিবাসীদের নিয়ে। বন ও আদিবাসীদের নিয়ে কাজে সেড সবসময় বন বিনাশ ও আদিবাসীদের অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে নানা অজানা তথ্য-উপাত্ত ও কাহিনী হাজির করেছে এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংকের নীতি ও কৌশল পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেড সবসময় বন, পরিবেশ, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে চিন্তার স্বচ্ছতা ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট থেকেছে।

এসোসিয়েটস (সহযোগী প্রতিষ্ঠান): প্রকল্পে জড়িত সহযোগী সংস্থা নয়টি: উত্তর-মধ্যাঞ্চল থেকে তিনটি—জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ (জেএইউপি), আচিক মিচিক সোসাইটি (এএমএস) এবং বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী সংগঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ছয়টি—উইমেন হেডম্যান কার্বারী নেটওয়ার্ক (ডব্লিউএইচকেএন), পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান নেটওয়ার্ক, ম্রোচেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার রক্ষা আন্দোলন, অনন্যা কল্যাণ সংগঠন (একেএস) এবং বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি (বিএনকেএস)। এসব সংগঠনের প্রত্যেকেই তাদের অঞ্চল, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই সহযোগীদের বেশির ভাগই সেড-এর সাথে কয়েক দশক ধরে কাজ করছে এবং প্রকল্প তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছে। তারা বন, বনজীবী মানুষ এবং তাদের অবস্থা ও সমস্যা বোঝার জন্য অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তারা প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সম্মেলন, গবেষণা, জরিপ ও অনুসন্ধানে অংশগ্রহণকারী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সহযোগীরা, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে, আদিবাসীদের মধ্যে ভালো অনুশীলন বা চর্চা নিয়ে গবেষণায় যুক্ত থাকবে। একইসাথে সহযোগীরা তথ্যচিত্র নির্মান এবং আলোকচিত্র তৈরিতে সহায়তা করবেন।

শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং গণমাধ্যম: গবেষণা, জরিপ বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও তথ্যচিত্র নির্মাণে প্রকল্পের কর্মীদের নানাভাবে সাহায্য করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মী এবং পেশাদার বন বিশেষজ্ঞ। জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক সনদ বিশ্লেষণ এবং আইন ও নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুপারিশ ও কৌশল প্রণয়নে বিশেষ করে আইনজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যুক্ত থাকবেন। এরা প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় প্রশিক্ষকেরও দায়িত্ব পালন করবেন।

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং প্রশাসন: পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক দল, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) প্রকল্পের কার্যক্রমে যুক্ত হবে। এসব প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিবে, অন্যদিকে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো কর্মকর্তা সরাসরি প্রশিক্ষণ, সংলাপ এবং সম্মেলনে প্রশিক্ষক, বক্তা ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এতে তারা আদিবাসী ও অন্যান্য বনজীবীদের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পাবেন এবং ভবিষ্যতে তাদের জন্য কাজ করবেন।

বন ও ভূমি সংহতি নেটওয়ার্ক: এ প্রকল্প তৈরির লক্ষ্যে যেসব পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয় সেখানে অংশগ্রহণকারী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলে বন এলাকার অন্যদের নিয়ে সেড-এর নেতৃত্বে একটি সংহতি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। এ সংহতি নেটওয়ার্কের সদস্যরা প্রকল্পের কাজে নানাভাবে পরামর্শ দিবে এবং সরাসরি যুক্ত থাকবেন।

বন ও বনজীবী মানুষ নিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

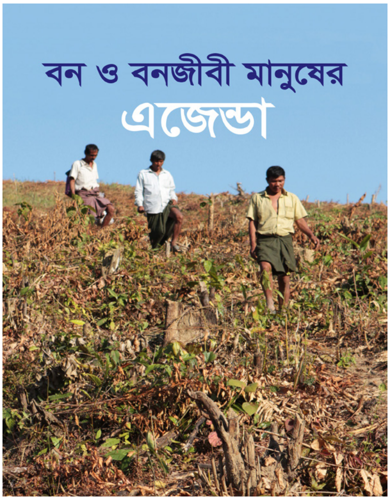

বন ও বনজীবী মানুষের এজেন্ডা

লেখা: ফিলিপ গাইন। ১১২ পৃষ্ঠা, ২০২৫। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। তিন দশকের অধিক সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা এবং সাম্প্রতিক সময়ের দুইটি পরামর্শ সভা ও একটি জরিপ ফলাফল হাতে নিয়ে বিষয়ভিত্তিক এ এজেন্ডা তৈরি করা হয়েছে। এজেন্ডায় বনের বর্তমান নাজুক অবস্থা, তার অন্তর্নিহিত কারণ, বনজীবী মানুষ ও তাদের সনাতনী ভূমির অধিকার এবং তাদের উদ্বেগের বিষয়সমূহের উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

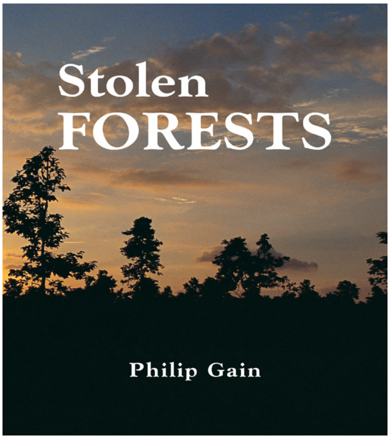

স্টোলেন ফরেস্টস

লেখক: ফিলিপ গাইন। ২১৬ পৃষ্ঠা, ২০০৬। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। বইটি দেশব্যাপী ব্যাপক বনবিনাশ নিয়ে বিস্তর আলোকচিত্র তথ্য বিশ্লেষণসমৃদ্ধ। লেখকের নিকট বন শুধুমাত্র গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলই নয় বরং বনের সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ আছে বনজীবী নানা জাতিগোষ্ঠী, তাদের জ্ঞান, শিক্ষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং আরো নানা কিছু।

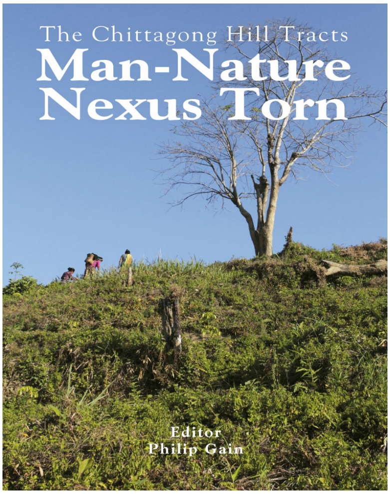

দ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস: লাইফ অ্যান্ড নেচার অ্যাট রিস্ক

সম্পাদক: ফিলিপ গাইন। পৃষ্ঠা ১২০, ২০০০। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। বইটিতে রাজা দেবাশীষ রায়, মেঘনা গুহঠাকুরতা, আমেনা মহসিন, প্রশান্ত ত্রিপুরা এবং সম্পাদকের গবেষণা নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি, জীবন এবং প্রকৃতি কীভাবে ঝুঁকির মধ্যে সেসব নিয়ে তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও আলোকচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম

সম্পাদক: ফিলিপ গাইন। পৃষ্ঠা ২৬৩, ২০০৪। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। বইটিতে ২০০৩ সালের জুনে সেড আয়োজিত একটি সেমিনারে প্রকাশ করা তথ্য ও উপাত্ত এবং বিভিন্ন লেখকের লেখা সংকলিত হয়েছে। বইটিতে গত দশকে বিভিন্ন সময়ে আদিবাসী, পরিবেশবাদী, অধিকার এবং উন্নয়নকর্মীদের গৃহীত সাতটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ

লেখক: প্রশান্ত ত্রিপুরা এবং অবন্তি হারুন। পৃষ্ঠা ১১৭, নভেম্বর ২০০৩। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। বইটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমচাষ সম্পর্কে লেখকদের গবেষণা এবং আলোচনার ফসল।

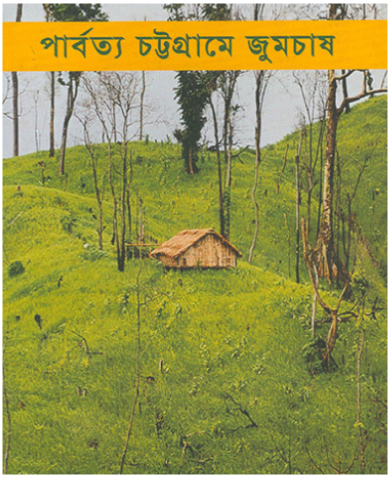

বাংলাদেশের বিপন্ন বন

লেখক: ফিলিপ গাইন। পৃষ্ঠা ২৭৬, ২০০৫। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। বছরের পর বছর বাংলাদেশের বন মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়েছে। লেখক বনবিনাশের কারণগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং এই বইটি সেই অনুসন্ধানের ফসল। এটি তাঁর "দ্যা লাস্ট ফরেস্টস অব বাংলাদেশ" বইয়ের একটি হালনাগাদ বাংলা সংস্করণ।

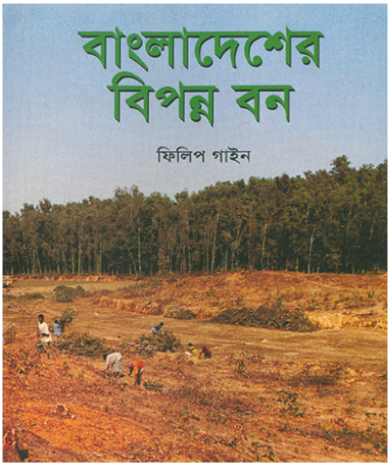

মধুপুর: অরণ্যের আর্তনাদ (ইংরেজী: মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন অ্যাগোনি)

লেখক: ফিলিপ গাইন। ইংরেজি: ১৬০ পৃষ্ঠা, ২০১৯, বাংলা: ১৭৪ পৃষ্ঠা, ২০২৩। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রকাশিত। জরিপ ও অনুসন্ধানভিত্তিক এ বইটি মধুপুর শালবন বিনাশ, প্রাকৃতিক অরণ্যের জায়গায় বাণিজ্যিক রাবার চাষ ও বিদেশি প্রজাতির বৃক্ষ দিয়ে কৃত্রিম বনায়ন এবং বন এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী ও বাঙালিদের ভূমির অধিকার নিয়ে। আলোকচিত্রের ব্যবহার বইটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ট্র্যাডিশনাল ইউজেস অফ এথনোমেডিসিনাল প্ল্যান্টস অফ দ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস

লেখক: সরদার নাসির উদ্দিন, সম্পাদক: ড. এম. মতিউর রহমান। পৃষ্ঠা ৮৯১, ২০০৬। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম থেকে প্রকাশিত। বইটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম কর্তৃক প্রণীত এবং পরিচালিত একটি প্রকল্পের ফসল।

দ্য লাস্ট ফরেস্টস অব বাংলাদেশ

লেখক: ফিলিপ গাইন। ২৩৬ পৃষ্ঠা, ২০০৬। সোসাইটি ফর

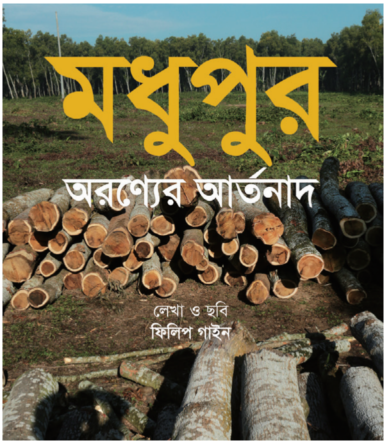

এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। জবরদখল, বাণিজ্যিক চাষ, রপ্তানীমুখী চিংড়ি চাষ ইত্যাদির ফলে ধ্বংস হওয়া বাংলাদেশের বন নিয়ে লেখকের গবেষণাধর্মী লেখা ও বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে এই বইয়ে।

বাংলাদেশ: ল্যান্ড, ফরেস্ট অ্যান্ড ফরেস্ট পিপল

সম্পাদক: ফিলিপ গাইন। ২৮৪ পৃষ্ঠা, ২০১৩। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। বইটিতে গবেষক, লেখক ও সাংবাদিকদের গবেষণাধর্মী নিবন্ধ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং বন এবং বনজীবী মানুষের গল্প নিয়ে লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব নিবন্ধ ও প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বনের শোচনীয় অবস্থা এবং এর পেছনে যেসব অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

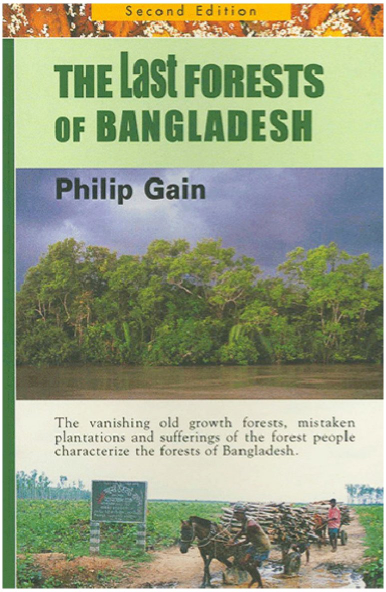

দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্টস অব দ্য পাল্প অ্যান্ড পেপার ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ

লেখক: আসফারা আহমেদ। ৪৪ পৃষ্ঠা, ২০১৩। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। এটি বাংলাদেশের পাল্প (মণ্ড) ও কাগজশিল্প নিয়ে লেখকের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেন। ১৯৫৩ সালে চালু হওয়া কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) প্রতিষ্ঠার পর থেকে কীভাবে পরিবেশ দূষণ করে যাচ্ছে, সেসব নিয়ে লেখক গভীর অনুসন্ধান করে লিখেছেন এ প্রতিবেদনটি।

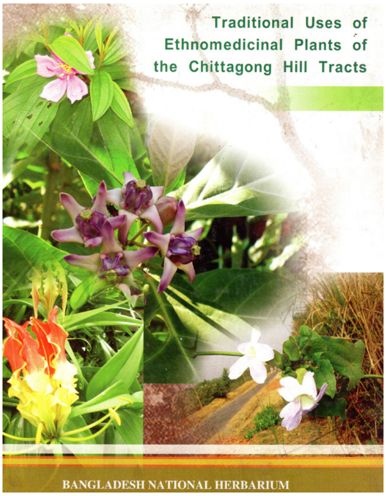

বন ও বনের আদিবাসী

সম্পাদক: ফিলিপ গাইন ও শিশির মোড়ল। ৭৬ পৃষ্ঠা, বাংলা, ১৯৯৬। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশিত। বন, বনজীবী মানুষ এবং বনের সংস্কৃতি নিয়ে ১৯৯৪ সালে এক সেমিনারে ভূমি, বন এবং আদিবাসী বিষয়ে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবিদ, উন্নয়ন ও মানবাধিকারকর্মী এবং বিশেষজ্ঞগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত দিয়েছেন সেসব সংকলিত হয়েছে এই বইয়ে।

ল্যান্ড অ্যান্ড ফরেস্ট রাইটস ইন দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস

লেখক: রাজা দেবাশীষ রায়। ৬২ পৃষ্ঠা, ২০০২। ইন্টারন্যাশনাল

সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউনটেন ডেভেলপমেনট (ইসিমোড), কাঠমান্ডু নেপাল থেকে প্রকাশিত। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার নিয়ে একটি আলোচনা নিবন্ধ। নিবন্ধে সশস্ত্র সংঘাতের ফলে মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কী বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে যেসব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক।

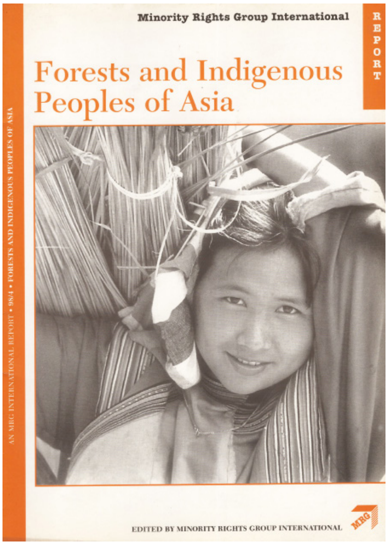

ইন্ডিজেনাস পিপলস অ্যান্ড ফরেস্টস ইন বাংলাদেশ

লেখক: রাজা দেবাশীষ রায় ও ফিলিপ গাইন। ১৯৯৯ সালে মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত 'ফরেস্ট অ্যান্ড ইন্ডিজেনাস পিপলস অব এশিয়া' শীর্ষক প্রকাশনায় প্রতিবেদনটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন, আদিবাসীদের ভূমি ও অরণ্যের অধিকার, প্রাকৃতিক বন উজাড় করে রাবার ও সেগুন চাষ এবং এর ফলে পরিবেশগত বিপর্যয়, বননীতি এবং আদিবাসীদের বন ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

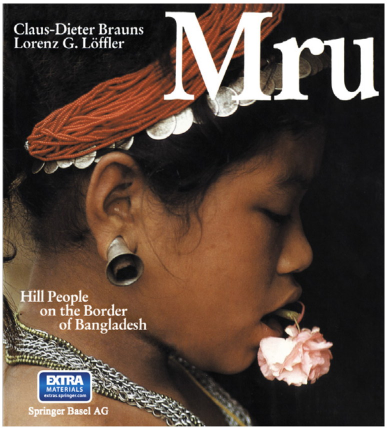

ম্রুঃ হিল পিপল অন দ্যা বর্ডার অফ বাংলাদেশ

লেখক: ক্লাউস-ডিটের, ব্রাউনস এবং লরেঞ্জ জি. লফলার। ২৫০ পৃষ্ঠা, ১৯৯০। বিরখাউসের ভারলেগ, বাসেল থেকে প্রকাশিত। শুধুমাত্র ম্রুদের উপর নয়, বাংলাদেশের যে কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড়মাপের গবেষণা ও গভীর পর্যবেক্ষণ থেকে লেখা বই। আলোকচিত্রী ক্লাউস-ডিটের ব্রাউনস এবং এথনোগ্রাফার লরেঞ্জ জি. লফলারের শ্রমসাধ্য ও নানা বিপদ উপেক্ষ করে গভীর মাঠ গবেষণার ফসল এ গ্রন্থ।

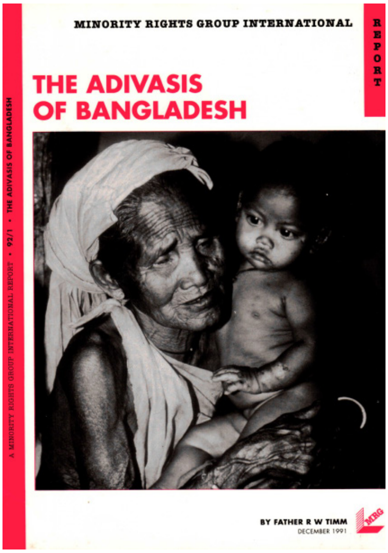

দ্য আদিবাসী'স অব বাংলাদেশ

লেখক: ফাদার আর ডব্লিউ টিম। ৩৬ পৃষ্ঠা, ১৯৯১। মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ প্রকাশিত প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে লেখা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বসতিস্থাপন, প্রাকৃতিক অরণ্য কেটে বাণিজ্যিক রাবার চাষ এবং মধুপুরের শালবন উজাড়ের বর্ণনা রয়েছে প্রকাশনাটিতে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত প্রথা ও রীতি

সম্পাদক: শক্তিপদ ত্রিপুরা, সুদত্ত প্রিয় চাকমা, চিনলামং চাক এবং জয় প্রকাশ ত্রিপুরা। ২০৪ পৃষ্ঠা, বাংলা, ২০১৩। মানুষের জন্য

ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রকাশিত। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪টি জাতিগোষ্ঠীর (ম্রো, খুমি, খিয়াং, চাক, পাংখোয়া, বম, লুসাই, তঞ্চঙ্গ্যা, সান্তাল, অহমীয়া, গুরখা, চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা) ভূমি সম্পর্কিত রীতিনীতি এবং অনুশীলনের উপর একটি গবেষণামূলক সংকলন।

পুসড টু দ্য এজ: ইনডিজেনাস রাইটস ডিনাইড ইন বাংলাদেশ'স চিটাগাং হিল ট্রাক্টস

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র। ৬০ পৃষ্ঠা, ২০১৩। গবেষণাপত্রটি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমি অধিকার নিয়ে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি ও জুন এবং ২০১২ সালের মার্চ মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গবেষক দলের সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সাথে কথা বলেন এবং সাক্ষাৎকার নেন। প্রকাশনাটিতে ছবি, ম্যাপ এবং রেফারেন্স উপকরণ দিয়ে সহায়তা করেছেন ফিলিপ গাইন।

তথ্যচিত্র

মান্দি

বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিক গারোদের সংগ্রাম এবং হাজার বছরের শালবন ধ্বংসের উপর ২৮ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র। তথ্যচিত্রের ইউটিউব লিঙ্ক:

https://www.youtube.com/watch?v=cCNhVqCs1GU

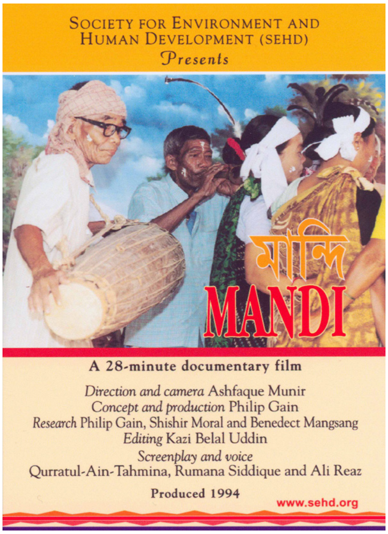

বিপন্ন বন (স্টোলেন ফরেস্ট)

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের নজীরবিহীন বনবিনাশের উপর সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) নির্মিত ৪৫ মিনিটের তথ্যচিত্র। তথ্যচিত্রের ইউটিউব লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=PFSzaNh3D90&t=323s

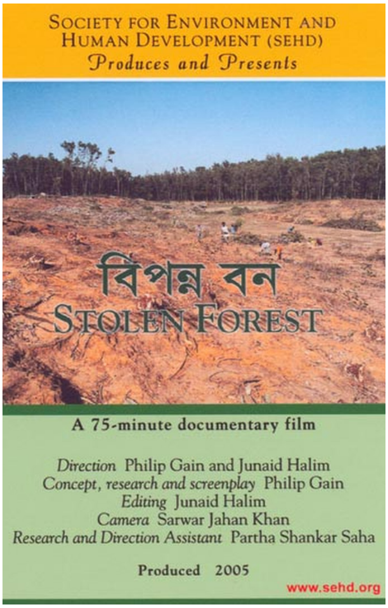

অরণ্যের আর্তনাদ [সিল্ভান টিয়ারস]

মধুপুর শালবন বিনাশ এবং বনজীবীদের মর্মবেদনার উপর সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) নির্মিত ৪০ মিনিটের তথ্যচিত্র। তথ্যচিত্রের ইউটিউব লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=_URtMWQxNXU&t=34s

‘বৃক্ষ রক্ষা কেবলই প্রথম ধাপ ... নিজেদের সুরক্ষাই আসল লক্ষ্য’

— চন্ডি প্রসাদ ভাট

যোগাযোগ

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১, ফ্ল্যাট ২এ (৩য় তলা), গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬, ০১৭১৫০০৯১২৩ E: philip.gain@gmail.com

www. sehd.org, www.brattyajan.org

১২ পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠার নিচের সারির ডান দিকের ছবিটি বাদে সব ছবি: ফিলিপ গাইন

লে-আউট: ও প্রসাদ সরকার